কবি কুণ্ডু মশায়

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

আজ দশ বৎসর পূর্বে এ ঘটনার প্রথম আরম্ভ। আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি বলেই এ গল্প লিখতে বসেছি। পুজোর সময় প্রত্যেক লেখকের কাছেই সম্পাদকের তাগিদ যায় 'মশাই, গল্প দেবেন একটা যত সত্বর হয়।'

এঁরা হলেন পেশাদার গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। হাতে পয়সা না পেলে এঁদের মন ভার হয়ে ওঠে, লেখনীও বিরূপ হয়। 'গল্প আছে, টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন।' কেনই বা বলবেন না, লেখকদেরও তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে !

খুব বড় একটা সাহিত্যসভায় বসে এই কথাটা মনে হয়েছিল। পত্রপুষ্পশোভিত তোরণদ্বার, মস্ত বড় মণ্ডপ, বহু বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যামোদী জনগণের সমাগম, আদর-আপ্যায়নও যথেষ্ট। পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা কত কবিযশঃপ্রার্থী হতভাগ্যদের সঙ্গে আমার কতবার পরিচয় ঘটেছে, কোনো সাহিত্যসভায় তাদের স্থান হয়নি কোনোদিন। অথচ তাদের মধ্যে প্রকৃত কবিমন, কল্পনার উদার প্রসার, ছন্দের বা কোনো শব্দের সৌন্দর্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ নয়—কিন্তু তাদের নেই কি, তাও আমি জানি। তাদের সেই বর্তমানের উপযোগী বিষয় নির্বাচনের ক্ষমতা। তাদের দৃষ্টি ১২৯০ সালের বাংলায় পড়ে আছে আজও—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের, দাশরথি রায়ের প্রভাব তারা আজও কটিয়ে পারেনি।

সেবার গরমের ছুটিতে দেশে আছি।

রাত প্রায় এগারোটা বাজে, বিছানায় ছটফট করতে পরে একটু নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে মাত্র।

—আছেন নাকি শ্যামবাবু ?

এত রাত্রে অপরিচিত সুরে কে ডাকে বুঝতে না পেরে বাইরে এসে বললাম—কোথা থেকে আসছেন ?

অন্ধকার রাত। দেখলাম আগন্তুক বিনা আলোয় এসেছে, যেখান থেকেই আসুক। লণ্ঠন জ্বেলে বাইরে আবার গিয়ে আগন্তুকের চেহারা এবার ভালো করে দেখলাম। বৃদ্ধ লোক, যাটের কাছাকাছি বয়স, গায়ে আধময়লা পিরান, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—বগলে একতাড়া বই বা কাগজ।

আগন্তুক বলল—আমায় চিনতে পারলেন না ?আমাকে সকলে কুণ্ডু মশাই বলে জানে।বসাকদের কাপড়ের গুদামে কাজ করি বল্লভপুরের বাজারে। তা আপনারা দেশে ঘরে থাকেন না, গরমের ছুটির পরই চলে যাবেন—চিনবেন কি করে।

কথাটা সত্যি। দেশে থাকলে চিনতাম বই কি—দেশেরই লোক যখন। বললাম—কি জন্যে আসা হয়েছে ?

—আপনি একজন রাইটার লোক, আমার লেখা কবিতা কিছু আপনাকে আজ শোনাতে এসেছি।

—ও, বসুন বসুন। যে বেশ কথা। দাঁড়ান একটা কিছু পাতি।

দস্তুরমতো অবাক হয়ে গেলাম। বল্লভপুরের বাজার এখান থেকে দু মাইলের সামান্য কিছু বেশি, এত রাত্রে নিছক কবিতা শোনাতে লোকটা কষ্ট করে এতদূর এসেছে—না, এমন ব্যাপার যেদেখিনি আদৌ একথা বললে ভুল হবে—জীবনে বারকয়েক এ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং আমি এদের ভালোও বাসি।

এরা সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক, এরা যশ পায় না, অর্থ তো পায়ই না—লেখার নেশায় লিখে যায়, যশের পরিবর্তে পায় অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ—তবু মদ ধরলে যেমন ছাড়া কঠিন হয়, তেমনই কঠিন হয়ে পড়ে লেখার বাতিক মাথায় একবার ঢুকলে তাকে তাড়ানো।

এ সবই আমি জানি। বললাম যে, এ ধরনের লোক এর আগেও আমি দেখেছি। সুতরাং এঁকেও যত্ন করে বসালাম। বাড়িতে থাকি আমি একা, দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই—নতুবা একটু চা খাওয়ালে দেখাত ভালো। কুণ্ডু মশায় তাঁর দপ্তর খুলে তিনখানা মোটা খাতা বার করে পড়ে যেতে লাগলেন অবিরাম একটানা। এসব দলের লোকেরা তাই করে থাকে। আমি কতবার কত জায়গায় দেখেছি।

মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলছিলেন—কেমন লাগছে শ্যামবাবু ?

—চমৎকার !

—হেঁ হেঁ—আপনারা রাইটার লোক, আপনাদের ভালো লাগলেই—। তার পর শুনুন এটা, 'সুভদ্রা-হরণ'—

—পড়ে যান।

একটানা চলেছে আবৃত্তির স্রোত—রাত বারোটা বেজে গেল।

কুণ্ডু মশায় নাকের চশমা নামিয়ে আমার মুখের দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে বললেন—কেমন ?

অর্থাৎ এটা আপনার ভালো লাগতেই হবে, উপায় নেই।

পুনরায় বললাম—চমৎকার !

এসব স্থলে এই জবাবই দিতে হয়, দেওয়া নিয়ম—অভিজ্ঞতাথেকে জানি।

—আচ্ছা এটা শুনুন—বাণ রাজার প্রতি ঊষা।

পুরাণ ভালো পড়া নেই, বললাম—বাণ রাজা কে ?

আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে কুণ্ডু মশায় বললেন—বাণ রাজার কথা জানেন না ?বাণ রাজার মেয়ে ঊষা, দৈত্যরাজ বাণ—

বাল্যকালে দৃষ্ট "ঊষা-হরণ' নামে এক যাত্রার অভিনয় অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল। বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যুদ্ধ হল, অনিরুদ্ধ-টনিরুদ্ধ—ঊষা-হরণ—

আমার পৌরাণিক জ্ঞানের অবস্থা বোধ হয় কুণ্ডু মশায়ের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখার সৃষ্টি করল। তিনি আবার পড়ে যেতে লাগলেন। সাড়ে বারোটা—পৌনে একটা। তিন-চারটি কবিতা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলে কুণ্ডু মশাই এবার ওঠবার জোগাড় করবেন বলে মনে হল। আমার দিকে চেয়ে বললেন—দোকানের কাজ করি সারাদিন, ফুরসত পাই নে। আপনারা কলকাতায় থাকেন, রাইটার লোক—আপনাদের শোনালে মনটা তৃপ্ত হয়। আর কাকে শোনাব বলুন—সব মুখ্যুর দল—

—আপনি বুঝি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন ?

–হ্যাঁ, খাতাপত্তর লিখি। রাত দশটার সময় ছুটি পেয়ে আহারাদি সেরে তবে আপনার কাছে আসছি। একটু শুনিয়ে মনটা ভালো হয়।

—কতদিন থেকে লিখছেন ?

—বাল্যকাল থেকে। পাঠশালায় যখন পড়ি, হাতের লেখার খাতায় কবিতা লিখতাম। গুরুমশায়ের কত বেত খেতে হয়েছে সেজন্যে মশায়। এখনো তাই। কেউ বোঝে না। দোকানে যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারা সবাই আমাকে খুব মানে, ভয় করে চলে—ভাবে, কবিতা লেখে, এ মস্ত পণ্ডিত। যা লিখি, তাই ভালো বলে। আমার তাতে তৃপ্তি নেই—যত গণ্ডমুখ্যুর দল, ভালো বললেই বা কি, আর মন্দ বললেই বা কি !

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া

বিতরতানি সহে চতুরানন।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং

শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

আমার হয়েছে ভাগ্যে প্রত্যেক দিন মশাই ওদের সঙ্গে কারবার—অরসিক নিয়ে রসের কারবার ! আমার ভালো লাগে মশাই, বলুন দিকি আপনি ?

—আপনি রবি ঠাকুরের নাম শুনেছেন ?

—হ্যাঁশুনিছি মশাই। রবি ঠাকুর মস্ত বড় কবি। কোথায় যেন বাড়ি, যশোর না বীরভূম—

—কোনো কবিতা পড়েছেন তার ?

—আজ্ঞে না।

কুন্ডু মশায় বিদায় নিয়ে উঠলেন রাত একটার সময়।

এরপর আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল—কলকাতায় কর্মকোলাহলের মধ্যে কুণ্ডু মশায়ের কথা ভুলেই গেলাম একরকম। বড়দিনের ছুটিতে দুদিনের জন্যে বাড়ি গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি যে দোকানে কাজ করেন, সে দোকানের মালিক ও-অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ধনী, জাতিতে তাঁতি—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তবে লেখাপড়া কিছু তেমন জানেন না। লোকটি সজ্জন, রায় সাহেব খেতাব পেয়েছেন।

রায়সাহেবের বাড়ি কি-একটা কাজ উপলক্ষে আমিও নিমন্ত্রিত। সেখানেই কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পান-বিড়ি বিতরণে তাঁকে ব্যস্ত দেখা গেল। আমি একবার বললাম—কি কুণ্ডু মশায়, ভালো তো ?

আমার দিকে চেয়ে তিনি একবার হাসলেন মাত্র, ব্যস্ত বলে আমার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ তাঁর তখন হল না।

রায়সাহেব হেঁকে বললেন—কুণ্ডু মশায়, চা দেওয়া হয়েছে কিনা সকলকে দেখুন একবার বাইরে গিয়ে।

আহারাদির পরে দেখি সদর দরজায় কুণ্ডু মশায় দাঁড়িয়ে। বললেন—কাল বাড়ি থাকবেন নাকি ?

—হ্যাঁ থাকব।

—কাল যাব একবার আপনার কাছে।

—নিশ্চয়ই আসবেন। লেখাটেখা আছে নাকি কিছু ?

—অনেক লিখে ফেলেছি তার পর। শোনাব।

কিন্তু বিশেষ কার্য উপলক্ষে তার পরদিন আমাকে চলে যেতে হল অন্যত্র। কুণ্ডু মশায়ের কবিতা শোনবার সুযোগ সেবার আমার হয়নি।

এক বৎসর পরে আবার দেশে গিয়েছি। বর্ষাকাল, পথে-ঘাটে একহাঁটু জলকাদা। বল্লভপুর ছাড়িয়ে নদীর ধারে বাবলাতলায় দেখি কে বসে মাছ ধরছে। আমি রাস্তা থেকেই পাড়াগাঁয়ের ধরনের জিজ্ঞেস করলাম—কি মাছ হল ?

লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে চাইতেই দেখি কুণ্ডু মশায়।

—কুণ্ডু মশায়, মাছ ধরতে এসেছেন নাকি ?ভালো সব ?

কুণ্ডু মশায় আমায় দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে বললেন—প্রাতঃপ্রণাম। এই আসছেন বুঝি ?

—কি মাছ পেলেন ?

—আজ্ঞে, মাছ ধরছি নে তো ! এই এমনি একটু বসে—মানে—একটু-আধটু লিখছি—

কৌতূহল হওয়াতে রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে দিয়ে দেখি কুণ্ডু মশায় ভিজে ঘাসের ওপর কাঁচা ডালপালা ভেঙে পেতে বসেছিলেন—পাশেই একখানা মোটা পুরনো রোকড় কি খতিয়ানের খাতা। একটা শরের কলম ও

পাঠশালার ছেলেদের মতো দড়ি-বাঁধা দোয়াত, যাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। একখানা মসীলিপ্ত ব্লটিং কাগজ মাটির ঢেলা-চাপা এক পাশে।

—বাঃ, এ যে কবিকুঞ্জ বানিয়ে তুলেছেন দেখছি !

—আজ আর দোকানে যেতে ভালো লাগল না।অনেকদিন বর্ষার পরে আজ একটু রোদের মুখ দেখা গিয়েছিল—এখন আবার মেঘ করেছে। বলি, যাই নদীর ধারে বসে...লেখার নেশা মাথায় একবার চাপলে—

—একটু শোনান কুণ্ডু মশায়। না শুনে আর যাচ্ছি নে।

কুণ্ডু মশায়ের কবিতার খাতা একখানা প্রাচীন খতিয়ান। খানিকটা পড়ে শোনালেন, কয়েক লাইন মনে আছে—

যদুকুলবধূ চতুরঙ্গিণী সহায়ে
কৃষ্ণতুল্য সুভদ্রারে সারথি করিয়া
আরোহিয়া কপিধ্বজে অর্জুনসমান
গাণ্ডীব কোদণ্ড ধরি উতরিব রণে।
শিখণ্ডী আমার জ্যেষ্ঠ, তারে নারী ভাবি।
ধরে না ধনুক ভীষ্ম, ...(মনে নেই)
ভূমণ্ডল অকৌরব করিবে দ্রৌপদী।

মজানদীর পাড়ে বিকেলে বসে বেশ ভালো লাগল। বললাম—চমৎকার ! আপনার শব্দ সাজাবার ক্ষমতা, ধ্বনির জ্ঞান, সব চমৎকার। দ্রৌপদী যুদ্ধযাত্রা করতে চাইছেন বুঝি ?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু কোন্ জায়গায় বলুন তো ?

মাথা চুলকে বললাম—তা তা—কই ঠিক তো বুঝতে পারছি নে—

কুণ্ডু মশায় আমার উত্তরের দিকে কান না দিয়ে বললেন—শুনে যান আর একটু—

শত তীক্ষ্ণ শর
মম করোন্মুক্ত যবে উঠিবে উড়িবে
গৃধ্রপংক্তি সম ব্যোমে শোণিতপিপাসু,
দেখিব কি করি করে ব্রতরক্ষা তাঁর
দেবব্রত। রণচণ্ডী শিখণ্ডী-ভগিনী
আখণ্ডলে রক্ষিলেও ছাড়িবে না তাঁরে।

হাসি-হাসি মুখে বললেন—কেমন ?

—এ আর বলতে ! আমার খুব সৌভাগ্য যে আজ কবির মুখে—কি ঝঙ্কার !

কুণ্ডু মশায় বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—অমন কথা বলবেন না, আপনারা রাইটার লোক—

—ভাষার ওপর সমান অধিকার সব লেখকের থাকে না। আপনার তা আছে কুণ্ডু মশায়। আর আপনি একজন সত্যিকার কবি। নয়তো পালিয়ে এসে এই নদীর ধারে বসে আপন মনে—

কুণ্ডু মশায় পাশের একটি থেলো হুঁকো তামাক সাজছিলেন এতক্ষণ। আমায় বললেন—খান ?

—না। আপনি খান।

হুঁকোয় বেশ আরামে টান দিয়ে বৃদ্ধ এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চাইলেন, যেনজীবনের এক বড় আনন্দের সম্মুখীন হয়েছেন—অর্থাৎ থেলো হুঁকোটিতে টান দেবার অবকাশ পেয়েছেন।

বললেন—আমার মাথায় যখন লেখার নেশা চেপে যায়, তখন আর কিছুই ভালো লাগে না। পালিয়ে আসতেই হবে—একটু ফাঁকা নির্জন জায়গা খুঁজতেই হবে !

—আপনার বাসা তো নির্জন ?আপনি তো একাই থাকেন শুনেছি।

—মোটেই না। কাপড়ের গদির সাতজন কর্মচারী সব এক ঘরে থাকি। সব কজন সমান গোলমাল করে। সেখানে বসে লেখা...কাল আসবেন দয়া করে ?দেখবেন ?

পরদিনই কুণ্ডু মশায়ের বাসায় গেলাম। কুণ্ডু মশায় এক বর্ণ অতিরঞ্জিত বলেননি। বসাকদের কাপড়ের গদির পেছনে অতি অন্ধকার, প্রায় জানালাবিহীন নাতিক্ষুদ্র একটা ঘরে চারখানি সরু সরু তক্তপোশ পাতা। প্রত্যেক তক্তপোশে কাপড়ের গাঁটবাঁধা চট আগে পেতে তার ওপর অতি মলিন শয্যা বিস্তৃত। বালিশগুলো থেকে চিমটি কাটলে তেল আর ময়লা ওঠে। ঘরে আড়াআড়ি অনেকগুলো দড়ি টাঙানো—তাতে ময়লা ও আধময়লা লুঙ্গি, ন-হাতি কাপড়, সেলাই করা পুরনো কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া। একটা তক্তপোশের তলায় একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর একজোড়া নতুন বাদামী রঙের ফিতে-আঁটা জুতো সযত্নে তোলা। দেওয়ালে পেরেক দিয়ে আঁটা বিবর্ণ পুরনো খবরের কাগজ। তার ওপরে কাঠের ছোট আলনায় দু-একটা ছিটের কফ-আঁটা কামিজ, কোনোটায় কুষ্টিয়ার ছিটের একটা আলোয়ান। সমস্ত ঘরটা স্থূলত্ব, নোংরামি, কুশ্রীতা, রুচিহীনতার একখানি সুস্পষ্ট ছবি।

একপাশের তক্তপোশে জনচারেক লোক বসে তাস খেলছে, কারো গা খোলা, কারো গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। আমার প্রশ্নের উত্তরে একজন বললে, কুণ্ডু মশায় গদি থেকে ফেরেননি। একজন কুণ্ড মশায়ের খাটখানা আমায় দেখিয়ে দিলে। তাঁর বালিশ ততোধিক ময়লা, উপরন্তু একটা ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বসবার পরে তাস-খেলোয়াড়দের হর্ষধ্বনি ও চিৎকার আমার নিকট অসহ্য মনে হওয়ায় একটু বাইরে যাব ভাবছি, এমন সময়ে কুণ্ডু মশায় ঘরে ঢুকলেন।

ওদিকে খেলোয়াড়দের একজন বলে উঠল—ও দাদু, তোমার ইলিশ মাছ সব কানু খেয়ে—এই দেখো !..বক্তা মুখে পুরে দেবার অভিনয় করে ব্যাপারটা বোঝালে।

আর একজন বললে—এত দেরি হল কেন ?বাবুর হাতে নাকানিচোবানি খেয়েছ কেমন বল ?

আমার দিকে চেয়ে কুণ্ডু মশায় বললেন—আপনি যে ! আপনি যে এখানে আসবেন, তা ভাবিনি। বসুন, দুটো খেয়ে আসি। এখন ছুটি পেলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে—

বেলা আড়াইটে উত্তীর্ণ-প্রায়। ক্ষুধার্ত বৃদ্ধকে আমি একটুও দেরি করতে দিলাম না। বললাম—যান শিগগির যান, আহার করে আসুন।

কুণ্ডু মশায় চলে গেলে আমি তাস-খেলুড়েদের উদ্দেশ করে বললাম—এখানে খাওয়া হয় কোথায় ?

একজন বললে—এই ঘরের পর উঠোন, তার ওদিকে রান্নাঘর। গদির ঠাকুর আছে, সেই রাঁধে।

—কি রকম খাওয়ায় ?

—সে কথা আর ওঠাবেন না দাদা। উরসুনি ডালের জল, এই এতটুকু খয়রা মাছ কি তিৎপুঁটির ঝোল, একটা লাল ডাঁটা দিয়ে কুমড়ো দিয়ে ঘ্যাঁট—ছিঃ—মানুষের যুগ্যি নয় !

একজন বলে উঠল—পরের পয়সায় খেতে আর কত দেবে বলো ?ওই যা পাচ্ছ, তাই ঢের।

কুণ্ডু মশায় পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে এলেন, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল। তার পর কাপড়ের গাঁট-বাঁধা চটের উপর শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করে আমার দিকে চেয়ে বললেন—এখানে এসে বসুন।

—চলুন না দীঘির ধারে গিয়ে একটু বসা যাক।

—আজ আর ছুটি নেই, কলকাতা থেকে মহাজন আসবে এই ট্রেনে, হিসেব ঠিক করে দিতে বলেছেন বাবু—ও গোষ্ঠ, পাইকেরি মালের ফিরিস্তিগুলো করে ফেল গিয়ে—বসে তাস পিটলে চলবে না !

এমন সময়ে হঠাৎ হল্লা ও হাসি মন্ত্রমুগ্ধবৎ থেমে গেল।

রায়সাহেব ঘনশ্যাম বসাকের স্থূল, চিক্কণ, সুখাদ্য-পরিপুষ্ট দেহ দোরের কাছে দেখা যেতেই তাস-খেলোয়াড় কজন এবং কুণ্ডু মশায় তড়াক করে চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রায়সাহেব বললেন—এত গোলমাল কিসের কুণ্ডু মশায় ?

ঘরের মধ্যে সকলের অবস্থা তখন হঠাৎ হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকলে কোলাহলরত স্কুলের ছাত্রদের মতো। সবাই পাষাণমূর্তির মতো একদম জমে গেল। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে রায়সাহেব বললেন—এই যে শ্যামবাবু যে—এখানে আপনি ?

—একটু কুণ্ডু মশায়ের কাছে দরকার ছিল।

—কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আপনার বনবে ভালো। কুণ্ডু মশায় শুনেছি কবিতা লেখেন। মানে, লোকটা ছিল ভালোই, কিন্তু ওর মাথায় কি পোকা আছে ?থাকে থাকে, ফট করে একদিন দেখি গদিতে নেই। কোথায় গেল ?বসে নাকি কোথায় কবিতা লিখছে ! আমার গদির কাজ চলে কি করে ?কবিতা লিখে তো পেট ভরবে না দাদা। কি বলেন ?

তা বটে !

রায়সাহেব কুণ্ডু মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন—যাও সব, গদিতে যাও। এখানে হল্লা করবার জন্যে তোমাদের রাখা হয়নি—কবিতা লেখবার জন্যেও নয়। যাও—কুণ্ডু মশায়, মহাজনের দেনাপাওনার হিসেবটা বেলা পাঁচটার মধ্যে ঠিক করে ফেল গিয়ে। যাও সব।

পরে ঘরের চারিদিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—নিজের থাকে—অথচ ঘরদোর বিছানাপত্তর কি নোংরা করেই রাখে—রামোঃ ! ও সতীশ, দশগজা ফুলন শাড়ির একজোড়া কাল হিসেবের খাতায় ওঠেনি কেন ?

সতীশ নামধেয় লোকটি এতক্ষণ তাসের আড্ডায় বেশি চেঁচামেচি করছিল। সে যেন অতিরিক্ত বিস্ময়ে হঠাৎ কাঠ হয়ে বললে—সে কি বাবু ! দশগজা ফুলন শাড়ি কাল কে বিক্রি করলে ?এই তো কুণ্ডু মশায়, জানেন ?

কুণ্ডু মশায় নিজের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বললেন—আমি কি জানি বাপু ! আমি খতেন রোকড় নিয়ে আছি, তোমাদের খুচরা বিক্রির বিলে কি হয় না হয়—

রায়সাহেব বলিলেন—সব চোরের আড্ডা হয়েছে। ভাত-কাপড় দিয়ে চোর পোষা। আচ্ছা, আজ ধরা পড়লে তাকে আমি জবাব দেব, নয় এক মাসের মাইনে কাটব।

রায়সাহেব চলে গেলেন।

এই হল কুণ্ডু মশায়ের প্রতিদিনের জীবন। এই অত্যন্ত স্থূল আবহাওয়ার মধ্যে একটি কবিপ্রাণ কিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে, তা আমার অভিজ্ঞতায় লেখা নেই। কুণ্ডু মশায়ের এই বয়সেও যে সজীবতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট, ছাইপাঁশ আহারেও তাঁর যে তৃপ্তি, এত হট্টগোল ও অপমানের মধ্যেও তাঁর যে আনন্দ—এ সবের জন্য সমঝদার লোকমাত্রেই তাঁকে হিংসে না করে পারবে না।

তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ আর অনেকদিন হয়নি।

এর প্রায় পাঁচ বছর পরের কথা। অন্য জায়গায় কাজ করি বলে দেশে আসা ঘটেনি অনেকদিন। দেশের বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছিল, মিস্ত্রি লাগিয়ে মেরামত করছি।

—এই যে শ্যামবাবু, প্রাতঃপ্রণাম !

চেয়ে দেখি, কুণ্ডু মশায়। আরো বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, মাথায় আর এক গাছাও কাঁচা চুল নেই। সেই পুরনো ধরনেই বেনিয়ান গায়ে।

—কি ব্যাপার কুণ্ডু মশায় ?ভালো আছেন বেশ ?খবর কি ?

—বাবু পাঠিয়ে দিলেন। আপনি বাড়ি করবেন,—চুন সিমেন্ট নেবেন আমাদের নতুন আড়ত থেকে। দর সস্তা।

—ও। কে, ঘনশ্যামবাবুরা চুনের আড়ত খুলেচেন বুঝি ?

—চুন, সিমেন্ট, মগরার বালি—

—বেশ বেশ। বসুন।

—না, আর বসব না। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ি থেকে।

—কবিতা লেখা-টেখা হয় কি আর ?

—আপনি আছেন তো এখন, আসব একদিন।

বলে সামান্য কয়েক পা গিয়েই ফিরে এসে বললেন—ভালো কথা, পকেটেই আছে, আজ আপনার এখানে আসতে আসতে বটতলায় বসে লিখলাম কটা লাইন—

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্যে ভাসায়ে আঁখি

সাধ হয় অনিমেষে শুধু যেন চেয়ে থাকি।

নীরবে নিঝুমে সেথা কি যেন মুখের ’পরে

স্বপ্নরেণু কিংবা মায়া নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।

পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা;

কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগলপারা ?

কুণ্ডু মশায়কে কোলে তুলে নিয়ে নাচবারইচ্ছে হল, ব্রাহ্মণ না হলে পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম। বললাম—এই কটা লাইন এইমাত্র লিখলেন পথে আসতে আসতে ?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—বটতলার ছায়ায় বসে, খানিকটা আগে।

—আপনি ঘনশ্যামবাবুর দোকানে কাজ করেন বটে কিন্তু আপনি সে জায়গার উপযুক্ত নন। কবিতায় আর্টের কোনো দরকার নেই। আপনার মনের আনন্দের অনুভূতিকে ধ্বনি ও ঝঙ্কারের মধ্যে প্রকাশ করেছেন এবং সফল হয়েছেন, সেইটেই বড় কথা। আমি আপনার মনের সেই সময়ের অনুভূতিকে ওই কটা কথার মধ্যে দিয়ে নিজের মনে ধরতে পারছি—ওই হল কবিতা।

চুন কিনতে গিয়ে রায়সাহেবের দোকানে বসলাম খানিকটা। মস্ত বড় গদি, লোকজন খাটছে, নানারূপ ব্যবসাদারি শব্দ ও বোল উত্থিত হচ্ছে—‘ছএর দাগের নিয়ে এস’, ‘বাইশশ বাইশ রেলি দশ জোড়া’, ‘মিহি জরিপাড় চন্দননগর’, ‘খতেনের আঠারর পাতা’ ইত্যাদি। পাইকারি ক্রেতাদের বড় ভিড় লেগেছে, ঝম্ ঝম্ টাকার শব্দ উঠছে—ওদিকে গদির এক পাশে আনকোরা টাটকা দশটাকার নোট তাড়াবন্দী হচ্ছে।

ঘনশ্যামবাবুকে একপাশে বসে থাকতে দেখে কাছে গেলাম। গত পাঁচ বৎসরে রায়সাহেবের বয়স যেন পনেরো বছর বেড়েছে। আমায় বললেন—আসুন, বসুন শ্যামবাবু, অনেকদিন দেখিনি।

—ভালো আছেন ?

—ভালো কোথায়, আজ বছরাবধি ভুগছি নানা অসুখে। আর এইবার বোধ হয় চললাম—

—না না, সে কি কথা ! আপনার বয়েসটা কি !—আপনি জানেন না, দুটি হাজার টাকা খরচ করেছি এক বছরের মধ্যে। কিন্তু সারবার নামটি নেই, বেড়েই চলেছে। দোকানে আসি যাই—মনেও বল পাই নে, শরীরেও না। ডাক্তারের কথায় মাগুরমাছের ঝোল খাই কাঁচকলা আর পটল দিয়ে—একবেলা দুখানি সুজির রুটি।

—কোথাও চেঞ্জে যান না কেন ?

—ব্যবসা ফেলে যেতে পারি নে। আবার নতুন চুন সিমেন্টের আড়ত খোলা হয়েছে, এসব কার ওপর দিয়ে—

রায়সাহেবের কথার সুরে এবং মুখের চেহারায় একটা জিনিস বেশ সুস্পষ্ট হল আমার কাছে, তাঁর মনে আনন্দের অভাব এবং একটা ভয়ের ভাব। কথাবার্তার মধ্যে কণ্ঠের যে মিহিসুর ধ্বনিত হচ্ছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মৃত্যুভয়, জড়িয়ে রয়েছে নৈরাশ্য ও মূঢ় অন্ধতা। এত ঐশ্বর্য থেকেও ভোগের তৃপ্তি নেই।

যতক্ষণ আমি সেখানে বসে ছিলাম, ঘনশ্যামবাবুর মুখে আমি আনন্দের রেখা খোঁজবার বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। আনন্দের পরিবর্তে বরং ভয়টা এত বেশি দেখেছি যে লোকটার কাপুরুষতার ওপরে আমার ঘৃণা জন্মেছে। এত টাকা থেকেও লোকটা সত্যিকার অসুখী। বাইবেলের সে বাণী মনে পড়ল—Men cannot live by bread alone—জীবনের বড় পুঁজি নেই যেখানে, সেখানে শুধু টাকার পুঁজি মানুষকে অমৃতের পুত্রত্ব দান করে সাধ্য কি তার ?

তারও চার বৎসর পরে এবারের কথা।

বাড়িতে এসেছি দশ-বারো দিন কি তার বেশি। কাজের গোলমালে অন্য কোথাও যেতে পারি নে—কেবলমাত্র একদিন বল্লভপুর বাজারে অতি অল্প সময়ের জন্যে রায়সাহেবের গদিতে গিয়েছিলাম। কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই পর্যন্ত, কথাবার্তা বিশেষ কিছু হয়নি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে বসে আছি, একজন লোক এসে বললে—শ্যামবাবু এ বাড়িতে থাকেন ?লোকটার খালি পা, হাতে একটা লাঠি আর হারিকেন লণ্ঠন।

—কোথা থেকে আসছ ?

—আজ্ঞে বাবু, প্রণাম হই, বল্লভপুরের আড়তের কুণ্ডু মশায় আপনাকে ডেকেছেন। তিনি বাঁচবেন না, আপনাকে এখুনি যেতে হবে।

—কুণ্ডু মশায় বাঁচবেন না। কেন, কি হয়েছে তার ?

—বাবু, তিনি আজ সাত দিন শয্যাগত। জ্বর, কাশি—

—তা আমি তো ডাক্তার নই ?আমি কেন যাব ?

—তিনি সন্ধে থেকে কেবল আপনার কথা বলছেন। আমায় বলে দিলেন, যে-করে হোক নিয়েই আসতে হবে তাঁকে।

আমি একটু বিরক্ত না হয়ে পারলাম না। অনেক দিনের অদর্শনে কুণ্ডু মশায়ের ওপর পূর্বের আন্তরিকতা অনেকখানি চলে গিয়েছে। তবুও গেলাম। মুমূর্ষু বৃদ্ধের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সেই আড়তের ঘরের সেই বিছানাতে কুণ্ডু মশায় শুয়ে। মাথার শিয়রে কেবল একটা ছোকরা বসে আছে—ঘরের মধ্যে আর কেউ

নেই। একটা লণ্ঠন আধ-নেবানো ভাবে জ্বলছে ঘরের মেজেতে। একটা বাটিতে আধবাটি জল-বার্লি। গোটাকতক কাগজি নেবুর খোসা লণ্ঠনের পাশে।

কুণ্ডু মশায় বোধ হয় ঘুমুচ্ছিলেন কিংবা অর্ধচেতনভাবে শুয়েছিলেন। ছেলেটি ডাকলে—ওদাদু, দাদু, বাবু এসেছেন—

কুণ্ডু মশায় চমকে বলে উঠলেন—অ্যাঁ—

—ওই সেই বাবু এসেছেন—

ততক্ষণ আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছি। কুণ্ডু মশায় হাতের ইঙ্গিতে আমায় বসতে বললেন। আমি বিছানার একপাশেই বসে বললাম—কি হয়েছে কুণ্ডু মশায়, জ্বর নাকি ?

প্রায় এক মিনিট কুণ্ডু মশায়ের কাছ থেকে কোনো উত্তর পেলাম না। তার পর ক্ষীণ স্বরে বললেন—আর কি, এবার চললাম শ্যামবাবু—

আমি ভরসা দেওয়ার সুরে বললাম—সে কি কথা ! এখনো কত কবিতা শোনাবেন আমাদের—যেতে দেব কেন ?

কুণ্ডু মশায়ের মুখে অস্পষ্ট লণ্ঠনের আলোয় যেন ক্ষীণ হাসির রেখা দেখতে পেলাম। বললেন, ডাক এসেছে। আপনার কাছে একটু অনুরোধ—সেই জন্যে...

—বলুন, বলুন।

—এই ছেলেটি দেখছেন—বড় সৎ, বাবুদের গদিতে কাজে ঢুকেছে এ বছর, ছেলেমানুষ—ওই দেখে।

আমি ছেলেটিকে বললাম—তোমার নাম কি ?

—সুশীল।

—এই ঘরের আর সব লোক কোথায় ?

—সব পালিয়েছে। দুজন কাল ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে, দুজন দোকানঘরে শুয়ে আছে। বারান্দায়।

কুণ্ডু মশায় যেন মাছি তাড়াচ্ছেন মুখের কাছ থেকে— দুর্বল হাতে দু-একবার এমনি ভঙ্গি করে চুপ করে রইলেন। প্রায় দশ মিনিট ঘরের মধ্যে কোনো শব্দ নেই। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার খাতাগুলো—

বুঝতে না পেরে বললাম—খাতা ?

—কবিতার খাতাগুলো আপনার হাতে দিয়ে যাব। বড় আদরের ! ছেলেমেয়ে নেই, ওই ছেলেমেয়ে। খাতাগুলো—থেমে থেমে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কুণ্ডু মশায় কথাগুলো শেষ করলেন।

—ব্যস্ত হবেন না। স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন। আচ্ছা সে হবে—সেগুলো কোথায় ?

কুণ্ডু মশায় শিবনেত্র হয়ে শিয়রে উপবিষ্ট ছোকরার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। ছেলেটি তখনই নিজে থেকে বললে—উনি আমায় সন্ধেবেলা বলেছিলেন গুছিয়ে রাখতে—ওঁর তরঙ্গ থেকে বের করে রেখেছি।

কুণ্ডু মশায় বললেন—এঁর হাতে দাও।

আমি হাতে নিয়ে বললাম—পেয়েছি। এগুলো কি করব বলুন আমায়।

আবার তিন-চার মিনিট কেটে গেল—রোগী নিরুত্তর। তারপর আমার হাতে দুর্বল হাত তুলে দিয়ে বললেন—আপনার কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন। ওদের যত্ন আর কোথাও হবে না। ভার নিলেন ?

—নিলাম, ভাববেন না।

কুণ্ডু মশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—আর কোনো ভাবনা নেই। মরণে ভয় করি নে, বয়েস হয়েছে। এই খাতাগুলো—।শেষের দিকে কথাগুলো যেন কুণ্ডু মশায় আপন মনেই বললেন।

এই তাঁর শেষ কথা। আমি সারারাত বসে ছিলাম তাঁর শয্যাপার্শ্বে। রাত্রিশেষে কুণ্ডু মশাই মারা গেলেন। শবানুগমনের সময় আমি সঙ্গে যাওয়া কর্তব্য বিবেচনা করলাম। আমারই অনুরোধে তাঁর প্রিয় মজা খালের ধারে তাঁর দাহকার্য সমাধা হল। চিতার ওপর আমি আমার নিজের হাতে বন্য ছোটগোয়ালে লতার ফুল নিকটবর্তী ঝোপ থেকে তুলে এনে ছড়িয়ে দিলাম।

রায়সাহেবের সঙ্গে দিন চারেক পরে দেখা। আমায় বললেন—আপনি সেদিন শুনলাম খুব করেছেন। লোকটা নিজের দোষেই মারা গেল।